

ভারতের এক বিদ্যাজীবী পরিবারের সফল উত্তরাধিকার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (জন্ম : চব্বিশপরগনার নৈহাটি, ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩; মৃত্যু : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১)। তার প্রকৃত নাম শরণনাথ ভট্টাচার্য। প্রবন্ধের ভাষায় এবং পরিবেশনশৈলীতে তার প্রাতিশ্রিকতা পাঠকের নজর কাড়ে। ‘তেল’ (প্রথম প্রকাশ : ‘বঙ্গদর্শন’, চৈত্র ১২৮৫) প্রবন্ধটিতে বিশেষভাবে পাঠকের অভিনিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে মননশীলতার পাশাপাশি সৃজনশীলতার প্রকাশও ঘটেছে। লেখক তার সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের মানচিত্র তুলে ধরেছেন বর্তমান প্রবন্ধটিতে। রচনাটির আরম্ভ এরকম—

তৈল যে কী পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবির কতক বুঝিয়াছিলেন, তাহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ বাস্তুবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর, অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কী? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে।

মানুষ মানুষকে স্নেহ করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই চিন্তাবিদদের চোখে স্নেহ বা ভিন্নার্থে তৈল আদান-প্রদান কোনো খারাপ বস্তু নয়। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয়, সমাজ রূপান্তরের পরিক্রমায় ‘তেল’ শব্দটির প্রয়োগ নেতিবাচক অর্থে প্রচলিত হয়েছে। কেননা, মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনে যেখানে শক্তি-বিদ্যা-ধন-কৌশল প্রভৃতি কোনো কাজে আসে না, তখন ‘তেল’ বেশ কাজ দেয়। ‘তেল’ শব্দটির এখানে তাৎপর্যগত অর্থ দাঁড়ায় মিথ্যা প্রশংসা বা লোক দেখানো স্তুতি। তার মানে, স্নেহ বা শ্রদ্ধা তার চরিত্র হারিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে তা ‘তেল’ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাপিত-জীবনে অবলোকন করেছেন : ‘বাস্তুবিকই তৈল সর্বশক্তিমান।

... যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সব কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না— উকিলিতে প্রসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না। যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসর হইতে পারে, আহাম্মক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্নর হইতে পারে।’

প্রসঙ্গত, প্রাবন্ধিক উপহাসাত্মকভাবে প্রকাশ করেছেন, ‘তেল প্রদান’-এর ‘মহিমা’ ও ‘অপরূপতা’র কথা। সামাজিকভাবে তেলের ব্যবহার-যোগ্যতাও তুলে ধরেছেন বর্ণনা সূত্রে। কলকারখানা পরিচালনা, প্রদীপ-জ্বালনা, তরকারি রান্না, চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজে যে তেলের প্রয়োগ অনিবার্য, তা-ও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তেলের নানান রূপ ও নাম বিষয়েও নাতিদীর্ঘ একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন দার্শনিক-প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ। আসুন, দেখে নেওয়া যাক ‘তেল’-এর বহুবিধ পরিচয় ও নামাবলী :

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সব পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তেলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য ‘ফিলিনথ্রপি’। যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়্যালটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি। চাকর-বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের কাছে তৈল দিয়া তৈল বাইর করি।

বিজ্ঞান বলে, বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ঘর্ষণে আগুনের উৎপত্তি। আর সে আগুন উৎপাদন ঠেকাতে মহৌষধ হিসেবে কাজ করে তৈল। তাই মেশিন প্রভৃতিতে তৈল প্রয়োজন পড়ে। এসব যুক্তিতর্কাদি পরিবেশন করে পণ্ডিত হরপ্রসাদ বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুই পক্ষের বিবাদ সামাল দিতে দরকার হয় ‘তেল’। তার মতে, ‘তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে-গৃহে গ্রামে-গ্রামে, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীতে,

রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসংবাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।’ সমাজের সব শ্রেণীর লোক ‘তেল’ লাভের প্রতীক্ষায় থাকে। এখানে কোনো ধনী-গরিব, চাকর-মালিক প্রভেদ নেই। তবে তেল প্রয়োগের উপযুক্ত প্রতিবেশ ও সময়টা বুঝতে হয়। এজন্য তেল প্রদানের সঙ্গে কৌশলের সম্পর্কে লেখক অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি জানেন, ‘কৌশল করিয়া একবিন্দুও দিলে যত কার্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।’ ঐতিহাসিক ও সমাজ বিশ্লেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও জানাচ্ছেন :

ব্যক্তিবিশেষে তেলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃতিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সন্মিলনী শক্তি আছে যে, তাহাতে উহা অন্য সব পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। বিদ্যার ওপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরও মূল্যবান। ... তেল দেয়ার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সবারই আছে এবং সুবিধামতো আপন গৃহে ও আপন দলে সবাই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে, বাইরের লোককে তেল দিতে পারে না। তেলদান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আমরা জানি, শিল্পকলা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং নানা চিন্তাবিদ্যার প্রসার ঘটেছে পৃথিবীময়। আবেগময়তা ছেড়ে মানুষ প্রায়োগিক জীবনের বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষাপ্রদান ও গ্রহণের পদ্ধতি ও কাঠামো। তবে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের বাইরে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, বিশেষ করে ‘তেল’ প্রদান এবং ছলা-কলার প্রশিক্ষণ-প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে, সে ব্যাপারে সামাজিক স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির কথা বলতে গিয়ে সামান্য বাঁকা সুর পরিবেশন করেছেন লেখক। এই ‘বিশেষ সামাজিক শিক্ষা’ সম্পর্কে সত্যাত্মবোধী হরপ্রসাদ বলেছেন : ‘তেলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোনো রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শিগগির একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। ... কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তেল সবাই দিয়া থাকেন- কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমতো লেকচার পাওয়া যায় না।’ বল-বিক্রম-বিদ্যা-বুদ্ধিবিহীন বাঙালির একমাত্র ভরসা যে ‘তেলমর্দন’, সে-বিষয়ে হরপ্রসাদ কোনো সন্দেহ পোষণ করেননি। আবার তেল-প্রয়োগ পদ্ধতিও যেসব বাঙালি সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি, তাও তিনি তার পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন। যশ-খ্যাতি যাই বলি না কেন, বাঙালির সমূহ সাফল্যের মূলে যে ওই ‘তেল’ তা যাপিত-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, প্রতিদিনের প্রতিবেশ থেকে জেনেছেন সমাজ-বিশ্লেষক হরপ্রসাদ। আর ‘তেল’-প্রয়োগ বিদ্যায় ‘বিলাতি’ ডিগ্রি (বিদেশপ্রিয়তা বুঝাতে!) কিংবা মাধ্যম হিসেবে ‘নারীকে ব্যবহার’ করতে পারলে যে সাফল্যের গতি বৃদ্ধি পায় সে কথাও স্মরণ রাখতে বলেছেন লেখক। শেষে বলেছেন, ‘মনে রাখা উচিত- এক তেলে চাকা ঘোরে আর-তেলে মন ফেরে।’

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘তেল’ সমকালে চেতনা-জাগানিয়া রচনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং উত্তরকালেও বিস্তৃত হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা। হরপ্রসাদের চিন্তা-দরোজা এবং প্রকাশের ভার ও দক্ষতা পাঠককে সামান্য হলেও নতুন করে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। কেবল নিজে চিন্তাবিদদের ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে নয়, আরও অনেককে চিন্তার ভুবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে, বোধহয় সমাজ-পরিবর্তনের ডাক দিতে চেয়েছেন দার্শনিক হরপ্রসাদ। সমাজকে তিনি ধরতে চেয়েছেন মানুষের

বিবেচনা ও প্রবণতার আলোয় এবং আড়ালের আলো-ছায়ায়। তাই তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন মানুষেরই মানচিত্র।